স্টাডি মেটেরিয়ালস

প্রথম সেমেস্টার, বাংলা সাধারণ (LC1)

রায়গঞ্জ সুরেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

পুরুষোত্তম সিংহ

‘পল্লীসমাজ’ উপন্যাসের নামকরণ ভাবনা

সৃষ্টির ক্ষেত্রে নামকরণ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কেননা নামকরণের মধ্য দিয়েই পাঠক প্রথম রচনার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে সাহিত্যিককে সবসময় সৃষ্টির নামকরণ নিয়ে ভাবতে হয়। মাতা যেমন নিজের সন্তানকে একটি সঠিক, তাৎপর্যপূর্ণ নাম দিতে চান তেমনি সাহিত্যিকও সচেতন থাকেন নামকরণ নিয়ে। সাহিত্যের নামকরণ নানা ধরনের হয়ে থাকে –চরিত্রকেন্দ্রিক, ব্যঞ্জনাধর্মী, ঘটনাপ্রধান বা বিষয়কেন্দ্রিক। আমরা শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের ‘পল্লীসমাজ’ উপন্যাসের নামকরণের সার্থকতা বিচার করে নিতে পারি।

শরৎচন্দ্র বিশ শতকের প্রথম অর্ধের পল্লিজীবনের একটি ছবি এ উপন্যাসে আঁকতে চেয়েছেন। গ্রাম সম্পর্কে শহরের লোকের যে ধারণা তা যে কতখানি ভুল এবং গ্রামজীবনকে দূর থেকে আমরা যতটা সহজ-সরল মনে করি তা যে নিছকই ভ্রান্তধারণা তা লেখক চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন এ উপন্যাসে। গ্রাম বলতে শুধুই যে ভালো নয়, সেই সঙ্গে রয়েছে কপটতা, কদাচার, মিথ্যাচার ও স্বার্থ সিদ্ধির চেষ্টা তা লেখক দেখালেন। তেমনি রয়েছে ব্রাহ্মণ শাষিত সমাজ ব্যবস্থার এক অধঃপতিত দিক। এ উপন্যাসে লেখক তিনটি দিকে নজর দিয়েছেন – বিশ শতকের গ্রামজীবনের চিত্র, সমাজ ব্যবস্থার বিবর্তনের চিত্র ও সমাজ অননুমোদিত একটি সরল নিষ্পাপ প্রেমের চিত্র। এই পবিত্র প্রেমে পল্লির সমাজ ব্যবস্থার চাপে পড়ে কীভাবে ধ্বংস পথে এগিয়ে গেল তা লেখক দেখালেন।

এ উপন্যাসের ঘটনা গড়ে উঠেছে ‘কুঁয়াপুর’ নামক একটি গ্রামকে কেন্দ্র করে। একদিকে আছে বেণী ঘোষালের মত সামন্ততান্ত্রিক জমিদার অন্যদিকে রমেশের মত প্রজাবৎসল্য ন্যায়পরায়ণ জমিদার। আর এই দুই শ্রেণির মধ্যে থেকে পৃষ্ট হতে হয়েছে রমাকে। একদিকে আছে ব্রাহ্মণ্য শ্রেণির শোষণ, অন্যদিকে মুসলিমদের নিজস্ব ধ্যান ধারণা নিয়ে বেঁচে থাকা। আসলে শরৎচন্দ্র সে শোষণের ইতিবৃত্ত জানতেন। ফলে মুসলিমদের প্রতি হিন্দু ব্রাহ্মণ জমিদারদের অত্যাচারের

বলিষ্ট ছবি আঁকতে তিনি পিছপা হন নি। রমেশের পিতৃশাদ্ধকে কেন্দ্র করে ধর্মদাস, গোবিন্দ গাঙ্গুলীদের আচারণ, তেমনি সামান্য মাছ নিয়ে বিবাদ, রমেশকে বিনা দোষে জেলে পাঠানো, সামান্য চালতা গাছ নিয়ে দুই পরিবারের বিবাদের মধ্য দিয়ে নিঃস্ব হয়ে যাওয়া – সবই পল্লিজীবনের এক নিষ্ঠুর বাস্তব চিত্র।

এই নিষ্ঠুরতার পাশাপাশি রয়েছে বিবেকসর্বস্ব ও হৃদয়বান মানুষের চিত্র। বিশ্বেশ্বরী জানতেন পল্লির এই নোংরা জীবনের ইতিবৃত্ত। তাই তিনি রমেশকে বলেছিলেন –"শুধু আলো জ্বেলে দেরে, শুধু আলো জ্বেলে দে। গ্রামে গ্রামে লোকে অন্ধকারে কানা হয়ে গেল। একবার শুধু চোখ মেলে দেখবার শুধু উপায়টা করে দে বাবা।" সে প্রচেষ্টা চালিয়েছিল রমেশ। আঘাতে আঘাতে সেও যেন বুঝতে শিখেছিল পল্লির আসল চিত্র কী, এবং পল্লিজীবনের সমস্যা কোথায়। সমাধানের পথ আবিষ্কারও করেছিল, আবার কখনো ব্যর্থ হয়ে পালাতেও চেয়েছিল। কিন্তু বিশ্বেশ্বরী জানিয়ে দিয়েছিলেন রমেশের মত সন্তানরা না থাকলে পল্লির চিত্র পাল্টাবে না, তাই শরৎচন্দ্র শেষ পর্যন্ত রমেশকে গ্রামেই রেখে দিয়েছেন।

রমা ও রমেশের প্রেমকে কেন্দ্র করে এ উপন্যাসের কাহিনি বলয় গড়ে উঠলেও লেখকের মূল লক্ষ্য ছিল পল্লিজীবনের সমগ্ররূপ ফুটিয়ে তোলা। আর সে যাত্রায় লেখক সফল ভাবে তা চিত্রিত করেছেন। সমালোচক পরিমল গোস্বামীর মতে –"এই চরিত্রগুলি শুধু কুঁয়াপুরের নয়, সকল পল্লীসমাজের পটভূমিতেই সত্য। বেণী ঘোষাল, মাসি, ভৈরব আচার্য, গোবিন্দ গাঙ্গুলী, ধর্মদাস, আকবর প্রভৃতি মানুষকে সকল গ্রামেই দেখা যাবে।" শরৎচন্দ্রের লক্ষ ছিল পল্লিজীবনের total life এর চিত্র তুলে ধরা, সে ব্যাপারে তিনি সে সফল হয়েছেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সেদিক থেকে 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নামকরণ সার্থক ও শিল্পসম্মত।

উপন্যাসের নায়ক চরিত্র বিচার

উ.- মানুষের জীবনকে নিয়েই গড়ে ওঠে উপন্যাস। সে মানুষ ভাল –মন্দ উভয় প্রকারই হতে পারে। উপন্যাসের নায়কই ঘটনা নিয়ন্ত্রক। তবে ব্যক্তি চরিত্র অপেক্ষা লেখক কখনও শ্রেণিচরিত্র, কখনও প্রকৃতিকেও প্রাধান্য দেন। ঘটনার জটিল আবর্তে থাকে নায়ক, তাঁকে কেন্দ্র করেই ঔপন্যাসিক ঘটনাকে নির্দিষ্ট পরিণতির দিকে নিয়ে যান। শরৎচন্দ্রের 'পল্লীসমাজ' উপন্যাসের নায়ক রমেশ। শরৎচন্দ্র বড় যন্ত্র করে এ চরিত্রকে গড়ে তুলেছেন।

কুঁয়াপুর গ্রামের তারিণী ঘোষালের পুত্র রমেশ। সে বড় হয়ে উঠেছে বাইরে। পিতার মৃত্যুতে ফিরেছে নিজের গ্রামে। আধুনিক, শিক্ষিত, রুচিশীল, আদর্শ ও বিবেকবান মানুষ রমেশ। পিতৃ শ্রাদ্ধ শেষ করেই সে শহরে ফিরে যেতে চেয়েছিল কিন্তু গ্রামের সংকটজনক অবস্থা দেখে সে আর ফিরে যেতে পারেনি। জন্মভূমির প্রতি এক অদ্ভুত মায়া তাঁকে

আঁকড়ে ধরেছিল। বলা ভাল শরৎচন্দ্র নায়ককে শহর থেকে গ্রামে নিয়ে এসে এ উপন্যাসের যাত্রাপথের অভিমুখ খুলে দিলেন।

রমেশ প্রথমে এসেই গ্রামের উন্নতি কল্পে নিজেকে উৎসর্গ করেছিলেন। কিন্তু কাজ শুরু করেই দেখতে পেলেন প্রকৃত সমস্যা কোথায়। গ্রাম বাংলার সেই অন্ধকার চিত্র দেখে মনে মনে ব্যথিত হয়েছেন –"হা ভগবান ! কোথায় সেই চরিত্র ? কোথায় সেই জীবন্ত ধর্ম আমাদের এই সমস্ত প্রাচীন নিভৃত গ্রামগুলিতে ?" পল্লির এই অধঃপতিত চিত্র দেখে সে পালাতে চেয়েছিল কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর কথায় আর পালানো হয় নি। এক পরোপকারী বিবেকবান হৃদয়সত্তা নিয়ে সে গ্রামের উন্নতিকল্পে ঝাপিয়ে পড়েছে। নানা আঘাত এলেও সে লক্ষে অবিচল থেকেছে, কেননা সে জানে গ্রামের উন্নতিই তাঁর একমাত্র ধ্রুব লক্ষস্থল। ফলে দাদা বেণীর সঙ্গে খণ্ড যুদ্ধ করতেও সে পিছপা হয়নি। তেমনি গ্রাম্য মাতব্বর ধর্মদাস, গোবিন্দ গাঙ্গুলীদেরও সে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছে।

রমেশ ছিল প্রজাবৎসল্য এক মানুষ। ফলে নিজে লোকসান স্বীকার করে যেমন পুকুরের জল ছেড়ে দিয়েছে তেমনি বেণীমাধব তা বাধা দিলে তার বিরুদ্ধেও প্রতিবাদী হয়েছে। শিক্ষার প্রতি তাঁর গভীর দৃষ্টি। ফলে স্কুল সে নিজেই তৈরি করে দিয়েছে। গ্রামের রাস্তা সংস্কারের জন্য গ্রামের মানুষদের অর্থ সাহায্য প্রার্থনা করেছি ঠিকই, কিন্তু ব্যর্থ হয়ে সে নিজেই তা করে দিয়েছে। গ্রামের মুসলিম প্রজাদের সে দরদ দিয়ে ভালোবেসেছে। তাই মুসলিম প্রজারা বিচারের জন্য আর আদালতে যায় নি, বড়বাবু রমেশের কথাকেই শিরোধার্য বলে মেনে নিয়েছে। তেমনি দ্বারিক চৌধুরীর মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিজেই হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। এইসমস্ত মহৎ কর্মে তাঁকে বাড়েবাড়ে আঘাত পেতে হয়েছে, আর তার মধ্য দিয়েই সে উপলব্ধি করেছে পল্লির প্রকৃত চিত্র।

এই সমস্ত কাজে বারবার বাধা এসেছে। সে বাধার সম্মুখীন হয়ে সে পালাতে চেয়েছে, কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর কথায় শেষ পর্যন্ত গ্রামেই থেকেছে–"তোমার আদেশকেই মাথায় তুলে নিলাম জ্যাঠাইমা। মরি এখানে সেও ঢের ভালো কিন্তু দুর্ভাগা গ্রামকে ছেড়ে আর কোথাও যেতে চাইব না।" সে শুধু হৃদয়বাণই নয় সেই সঙ্গে বলিষ্ট পুরুষ, ফলে লাঠিবাজিতেও আকবরকে সে আহত করেছে।

এই সমস্ত পরিচয়ের আড়ালেও রমেশের এক পরিচয় আছে সে হল প্রেমিকসত্তা। সে ভালোবাসত রমাকে, রমাও সমান ভালোবাসত তাঁকে। কিন্তু গ্রাম্য কদাচারে সে প্রেম পরিণতি পায়নি, তবে শ্রদ্ধাবোধ অটল ছিল। উপন্যাসের দশম পরিচ্ছেদে রমেশ ও রমা তারকেশ্বরে মিলিত হয়েছিল, তার এক হৃদয়গ্রাহী চিত্র ঔপন্যাসিক এঁকেছেন। যার মধ্য দিয়ে রমেশের ভালোবাসা ব্যক্ত হয়েছে –"এমন করে আমাকে কেউ কখনো খেতে বলেনি, এত যত্ন করে আমাকে কেউ কোনদিন খাওয়ায়নি। খাওয়ার মধ্যে যে এত আনন্দ আছে, আজ তোমার কাছ থেকে এই প্রথম জানলাম রমা।" রমেশই এ উপন্যাসের ঘটনা নিয়ন্ত্রক। পল্লির সমস্ত ঘটনা ঘটেছে রমেশের সামনে। সে সমস্ত ঘটনায় রমেশের প্রতিক্রিয়া বা কর্মদক্ষতা যেমন প্রমাণিত হয়েছে তেমনি সমস্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে পল্লির মানুষের রমেশকে জড়ানো বা আঘাত করা – এ সব ঘটনার মধ্য দিয়েই কাহিনি এগিয়ে গেছে পরিণতির দিকে। সবদিক থেকেই বিচার করে বলা যায় রমেশ এ উপন্যাসের নায়ক বা ঘটনা নিয়ন্ত্রক।

বিশ্বেশ্বরী বা জ্যাঠাইমা চরিত্র

শরৎ সাহিত্যের মূল লক্ষ বাংলাদেশের সমাজ জীবন ও পরিবার জীবন। বাঙালি জীবন ও পরিবারের ভাঙা-গড়া, ন্যায়পরয়ানতা, আদর্শবাদ ও বিচ্যুতির মধ্য দিয়েই তিনি কাহিনি বলয় গড়ে তুলতে ভালোবাসেন। সেই কাহিনির মধ্য যেমন জটিল স্বার্থসিদ্ধি মানুষ থাকে তেমনি আদর্শ পরায়ণ রমণীও থাকে। বিশ্বেশ্বরী তেমনই এক আদর্শবাদী, সমাজ সচেতন ও একনিষ্ঠ মহিলা। যিনি সমস্ত কদাচারের উর্ধ্বে সমাজের প্রকৃত সত্য কোথায় তা দেখিয়ে দিয়েছেন।

কুঁয়াপুর গ্রামের জমিদার বেণী ঘোষালের মা বিশ্বেশ্বরী, সম্পর্কে সে রমেশের জ্যাঠাইমা। রূপ গুণে সে সুন্দরী তেমনি কর্তব্যেও সে আদর্শ বাঙালি নারী। রমেশের বর্ণনায় _"আজও সেই কাঁচা সোনার বর্ণ। একদিন যে রূপের খ্যাতি এ অঞ্চলে প্রসিদ্ধ ছিল, আজও সেই অনিন্দ্য সৌন্দর্য তাঁহার নিটোল পরিপূর্ণ দেহটিকে বর্জন করিয়া দূরে যাইতে পারে নাই।" রমেশ পিতৃশ্রাদ্ধ শেষ করে শহরে ফিরে যেতে চেয়েছিল কিন্তু বিশ্বেশ্বরীর কথায় আর ফিরে যায় নি। তেমনি রমেশ পিতৃশ্রাদ্ধের সমস্ত দায়িত্ব তুলে দিয়েছিল জ্যাঠাইমার হাতেই। কেননা সে জানতো গ্রাম্য মাতব্বরদের একমাত্র বিশ্বেশ্বরীই শিক্ষা দিতে পারেন। অন্যদিকে গোবিন্দ গাঙ্গুলিরও মনে হয়েছিল –"গাঁয়ের মধ্যে বড়গিন্নী ঠাক্রুণের মতো মানুষও কি আর আছে ? না হবে ? ... গাঁয়ে যদি লক্ষী থাকেন ত সে তোমার মা।"

বিশ্বেশ্বরী চরিত্রে একদিকে সন্তান বাৎসল্য অন্যদিকে এক আদর্শ পরায়ণ মহিলার সত্তা ফুটে উঠেছে। ইতিপূর্বেই আমরা রবীন্দ্রনাথের 'গোরা' উপন্যাসে আনন্দময়ীর এক অপূর্ব মাতৃসত্তা ফুটে উঠতে দেখি। সেই আনন্দময়ীর প্রতিছবি আমরা দেখতে পাই বিশ্বেশ্বরী চরিত্রে। সে নৈতিক দিক থেকে ন্যায় সংগত হলেও নিজের ছেলের বিরুদ্ধে যেতে পারেনি। কোন মহিলার পক্ষেই সে যাত্রা সম্ভব নয়। এখানেই সে আদর্শ বঙ্গনারী। তাই রমেশকে জানিয়েছে –" তোমার জানা উচিৎ ছিল রমেশ যে আমার সন্তানের বিরুদ্ধে আমি যেতে পারবো না।" আবার এই বিশ্বেশ্বরীই সন্তানের আচারণে অতিষ্ঠ হয়ে কাশী চলে যেতে চেয়েছে। মনে রয়েছে ধর্মভয় –"এখানে যদি মরি রমেশ, বেণী আমার মুখে আগুইন দেবে। সে হলে ত কোনমতেই মুক্তি পাব না।"

তেমনি রমেশের চরিত্র গঠনেও বিশ্বেশ্বরীর ভূমিকাও কম নয়। বিশ্বেশ্বরী না থাকলে রমেশ হয়ত সে গ্রামে থাকতে পারতো না। তেমনি বালিকা রমাকেও সমস্ত বিপদ থেকে আগলে রেখেছিলেন বিশ্বেশ্বরী। তিনি শুধু রমা ও রমেশের পরামর্শ দাতাই নয় বিপদের সঙ্গী ও আত্মযন্ত্রণার অংশভাগী। তাই রমার অসুখে সবচেয়ে উদ্বিগ্ন তাঁকেই দেখায় –"রমাকে তিনি কন্যার মতই স্নেহ করিতেন, সেখানে কোন ফাঁকি ছিল না ; তাই সে অত্যন্ত স্নেহই রমার সম্বন্ধে তাঁহার সত্যদৃষ্টিকে

অসামান্যরূপে তীক্ষ্ন করিয়া দিতেছিল।“ তেমনি রমেশের প্রতি রমার আঘাতের বিরোধীতাও তিনি করেছেন। তিনি নারী হয়ে রমার যন্ত্রণা উপলব্ধি করেছিলেন, ফলে রমেশের ওপর সমস্ত অভিমান দূর করতে বলেছিলেন।

শরৎচন্দ্র বড় যন্ত্র করে গড়ে তুলেছেন এই বিশ্বেশ্বরীকে। রমা ও রমেশের দ্বন্দ্ব সমাসের মাঝখানে বিশ্বেশ্বরী না থাকলে কাহিনি হয়ত অন্য পথে যেতে পারতো। কিন্তু এই দুই চরিত্রের মধ্যে বন্ধনসেতু গড়ে তোলার কাজে লেখক যেমন বিশ্বেশ্বরীকে ব্যবহার করেছেন তেমনি কাহিনির যে গতিময়তা তা দ্রুত চালে ধাবিত হতেও সে সহায়ক। গ্রাম বলতে শুধুই যে খারাপ নয়, এখানেও যে আদর্শবান মানুষ আছে তার পরিচয় বিশ্বেশ্বরী।। তাই সমালোচক সুবোধ সেনগুপ্ত বলেছেন –“তাঁহার কোন আচারণের মধ্যে সাংসারিক সঙ্কীর্ণতার লেশমাত্র পরিলক্ষিত হয় না। ..... আদর্শ রমণীর পক্ষে যাহা সকল দিক দিয়া বাঞ্ছনীয় তাহা যেন তিনি অতি স্বচ্ছন্দে করিয়া গিয়াছেন।“

বিশ্বেশ্বরীর মধ্যে মাতৃস্নেহ ভরপুর। তাই বেণীকে ধরে নিয়ে গেলে সে ক্ষতবিক্ষত হয়েছে। কেননা বাঙলি রমণী কখনোই সন্তানকে বর্জন করতে পারে না, পারে নি বিশ্বেশ্বরীও। তবে এই যন্ত্রণাও সে সহ্য করতে পারে নি। সমস্ত যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পেতে সে কাশী যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সঙ্গে নিয়ে গেছে রমাকে। এমনি রমার ওপর রমেশের সমস্ত অভিমানের উৎসমূলও ভেঙে দিয়ে গেছে। কেননা তিনি জানেন এখন থেকে রমেশকে একাই এই গ্রামে থাকতে হবে। ফলে যেন কোন সংশয়ের বীজ মনে না থাকে। তেমনি আদর্শ শিক্ষা তিনি দিয়েছেন রমা ও রমেশকে। নিজের সন্তানকে আদর্শনিষ্ঠভাবে গড়ে না তুলতে পারার যন্ত্রণা যেন তিনি পুষিয়ে দিয়েছেন রমা ও রমেশের চরিত্র গঠনের মধ্য দিয়ে। আসলে নায়ক-নায়িকার পাশেও উপন্যাসে এমন কিছু চরিত্রের প্রয়োজন হয় যা পাঠকের মন জয় করে নেয়। বিশ্বেশ্বরী তেমনই এক নারী চরিত্র।

আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রাণাধিকেষু’ গল্পের শচীনাথ চরিত্র

আশাপূর্ণা দেবীর ‘প্রাণাধিকাসু’ গল্পে এক মধ্যবিত্ত পিতার করুণ আর্তনাদের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্পের শুরুতেই দেখা যায় শচীনাথ গভীর রাতে প্রায় চেতনাহীন হয়ে বাড়ি ফিরেছে থানা থেকে। থানায় বড়ছেলের মৃতদেহ চিহ্নিত করে সে ফিরেছে। আর বড়ছেলের মৃত্যুর জন্য মূলদায়ী ছোটছেলে। শচীনাথ ছোটছেলের জামিনের জন্য পুলিশের কাছে আবেদন করেছিল বটে, কিন্তু সে আবেদন খারিজ হয়ে গেছে। শচীকান্তের মনে দোলা দিয়েছে এই সংবাদ বাড়িতে জানাবে কী করে। তেমনি রয়েছে লোকচার ও ক্ষুধার জ্বালায় দ্বগ্ধ এক পিতার চিত্র।

বাড়ি ফিরে শচীনাথের অর্ধচেতন এক ছবি আমরা দেখি। সে প্রচণ্ড তৃষ্ণার্ত। কিন্তু এই পরিস্থিতে ঠাণ্ডা জলপান ঠিক হবে কি না এই সংকটে সে ভুগছে।

তাঁর মনে হয়েছে কেউ এসে যদি জল দিয়ে যেত তবু নয় হত, নিজেই জল নিয়ে নেওয়া হয়ত উচিত হবে না। কিন্তু মানুষের তৃষ্ণার কাছে লোকাচারের মূল্য কতটুকু ! ফলে একসময় ফটিকের কাছ থেকে জলের বোতল ছিনিয়ে নেয় –"প্রায় ওর হাত থেকে ছিনিয়ে নিলেন শচীনাথ ঠাণ্ডা কনকনে সেই জলের বোতলটা। জলটা নামতে লাগলো একটা মরুভূমির সড়ক দিয়ে –সব ঠাণ্ডা করতে করতে।" এরপর সে বাড়ির খবর নেয়। কিন্তু ফটিকের কাছে শোনে স্ত্রী সামান্য জলও স্পর্শ করে নি। নিজের এই আচারণের জন্য এবার সে নিজেই লজ্জিত –"শচীনাথের নিজেকে খুব ক্ষুদ্র অধম দীনহীন মনে হলো।"

আজ শচীনাথের মনে সংশয় কী করে স্ত্রীকে সন্তান খুনের কথা জানাবে। শচীনাথের অবচেতন বিশ্বে সেই সব প্রসঙ্গ উঠে আসে। পাঠক হিসাবেও আমরা সেই খুনের ইতিহাস জানতে পারি। কখনও মনে হয়েছে সন্তানদের নিজের আয়ত্বে রাখতে না পারার জন্যই আজ এমন পরিণতি ঘটেছে। কখনও মনে হয়েছে যে সময় ও সমাজে তাঁরা এখন থাকে সেখানে সন্তানদের আয়ত্বে রাখার আর কোন কৌশল নেই। আজ সে সন্তানহীন পিতা। সবাই ব্যস্ত স্ত্রীকে নিয়ে। সেও যে ব্যথিত সেদিকে কারও নজর নেই। আসলে হৃদয়ের গভীর তলদেশে তো পৌঁছানো অন্য মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। তেমনি শচীনাথের মনে পড়েছে ক্ষুধার কথা। আসলে মানুষটার পেটে প্রচণ্ড ক্ষুধা কিন্তু এই পরিস্থিতিতে খাওয়া উচিত হবে কি না এই চিন্তায় সে নিমগ্ন –"আশ্চর্য ! শচীনাথ কী পাথরে গড়া ? শচীনাথের একটা ছেলে খুন হয়ে মর্গে রয়েছে। আর বাকি ছেলেটা সেই খুনের আসামী হয়ে হাজতে রয়েছে, অথচ শচীনাথ কি না ফটিকের খাওয়ার কথা চিন্তা করছেন ? যে ফটিক বাড়ির একটা ছোঁড়া চাকর বৈ নয়।"

স্ত্রী আজ জলপান করেনি। এ বিষয়ে শচীনাথের নানা কথা বলার ইচ্ছা থাকলেও সে নিজেকে সামলে নিয়েছে। স্ত্রী আজ বিছানায় শুয়ে আছে। ভয়ংকর দুর্ঘটনা ঘটলেও দৈন্দিন জীবনের যে কোন কিছু থেমে থাকে না তা সে বোঝাতে চায়। কিন্তু তাঁর চোখের সামনে আগের রাত্রির সমস্ত ঘটনা ছবির মত ভেসে ওঠে। আজ সে স্ত্রীকে সান্ত্বনা দেয় – "বলবো না কেন ? জল তো খেতেই হবে ! এরপর চেয়ে খেতে হবে। মরুভূমির বালিতে ভেতরটা ভর্তি হয়ে যাবে না ?" শচীনাথ পূর্বে স্ত্রীকে 'প্রাণাধিকেসু' বলে চিঠি লিখলেও আজ সব সম্বোধন হারিয়ে ফেলেছে। আসলে যৌবন হারিয়ে গেছে। গল্পের শেষে এক নির্মম সত্যের মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। স্ত্রী মৃত সন্তানের খুনিকে দেখতে চেয়েছে। সে এ প্রসঙ্গ বারবার এড়িয়ে যেতে চেয়েছে –"অনেক দেখেছো তাকে "। শেষে স্ত্রীর কথায় স্বীকার করতে হয় সন্তানের প্রকৃত খুনি কে। গল্পের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এক আত্মদ্বন্ধ নায়ক শচীনাথ। সন্তান হারানোর যন্ত্রণাকে সে বুকে চেপে নিজেই পুড়েছে। তাঁর সান্ত্বনার কোন জায়গা নেই। এক ট্র্যাজিক পিতার করুণ চিত্র তাঁর মধ্যে আমরা দেখতে পাই।

'জালিয়াত' গল্পে সময় সমাজের প্রতিচ্ছবি

উ.-লেখিকা আশাপূর্ণা দেবী বিশ শতকের এক বিশেষ সময়ের এক মধ্যবিত্ত সংসারের ভাঙাগড়ার কাহিনি রচনা করতে চেয়েছেন 'জালিয়াত' গল্পে। সেই সময় ছিল সমাজ জীবনে প্রবল ঢেউ খেলানো এক মাতাল সময়। একদিকে পরিবারের রক্ষণশীলতা অন্যদিকে নতুন প্রজন্মের উচ্ছৃঙ্খলতা, বেপোয়ারা মনোভাব। কালের তরণীতে নবীনই বারবার জয় লাভ করে। আসলে সময়ের স্রোতকে অস্বীকার করা কোন সাহিত্যিকের পক্ষেই সম্ভব নয়। তাই কালের ধর্ম অনুসারে লেখিকাকেও সেই স্রোতকেই ফুটিয়ে তুলতে হয়েছে।

কন্যা পুত্রদের বেপোয়ারা মনোভাব থেকে সান্ত্বনা তাঁদের দূরে সড়িয়ে রাখার চেষ্ট করেছিলেন। কিন্তু যুগের রুচির কাছে হার মেনেছেন। আসলে তা সম্ভব ছিল না। পুত্র কন্যাদের তিনি শাসন করেছিলেন, কিন্তু কোন লাভ হয়নি। আসলে যুগের ক্ষেত্রে পরিবর্তিত জীবনবোধই ছিল সত্য। তাই বুলবুল চলে গেলে সান্ত্বনা বলেছে –"আমাকে পর্যন্ত না জানিয়ে তুই এতো দূর এগোবি ! আমি তোর বাপের মতো গোঁয়ার আড়বুঝো নই, আমার কাছে ব্যক্ত করলে, তোর সাপও মরতো, লাঠিও ভাঙতো না।" তেমনি তিনি সন্তানকেও সাবধান করেছিলেন –"কলেজ ফেরত এখান সেখান ঘুরিস কেন ? একবার বাড়ি এসে খেয়েটেয়ে তো যেতে পারিস বাবা ! আড্ডা বড়ো, না শরীর বড়ো ?"

বুলবুল সীতুরা সময়েরই প্রতিনিধি। সময়ের যাঁতাকালে বড় হয়ে ওঠা যুগের প্রতিবিম্ব। বুলবুল প্রথম থেকই আধুনিক নারী। কলেজ পালিয়ে সিনেমা দেখা, প্রেম, আড্ডা সবেতেই সে দক্ষ। বাড়িতে দেরি করে আসার জন্য তাঁর কোন অনুশোচনা বা ভয় নেই। এমনকি এই সব গহিত কর্মের জন্য সে পিতামাতাকেও তোয়াক্কা করে না। ফলে প্রেমিকের সঙ্গেই বাড়ির দর্জার কাছে এসে উপস্থিত হতে পারে। পিতা প্রতিবাদ ও চাপেটাঘাত করলে সেও ফিরিয়ে দিয়েছে – "ওকে আমি বিয়ে করবো।" প্রেমিকাকে সঙ্গে সঙ্গে ফোন করে বলেছে –"এখুনি এসে আমাকে এখান থেকে নিয়ে যাও।" সেই যে বাড়ি থেকে চলে গেল আর কোনদিন বাড়িতে ফেরে নি। পিতাও খোঁজ নেয় নি, কন্যাও সমবেদনা জানায় নি। আর এই ঘটনাকে লেখিকা চমৎকার ভাবে বর্ণনা করলেন –"বাপ মেয়েকে যে ওজনের চড়টা মেরেছিলেন, মেয়ে তার চতুর্গুণ ওজনের চড় বাপকে ফিরিয়ে দিলো।"

পুত্র সীতুও হয়েছে উচ্ছৃঙ্খল। পিতামাতাকে সে তেমন পাত্তা দেয় না। সকালে বাড়ি থেকে বের হয়ে যখন ইচ্ছা ফেরে। কলেজের নাম করে সে ইচ্ছা মত ঘুরে বেড়ায়। কলেজ যাওয়া অনেকদিন বন্ধ তবুও পিতামাতার কাছে সে কলেজের নাম ভাঙিয়ে দিব্যি ঘুরে বেড়াচ্ছে –"কলেজ আবার যাচ্ছে কে ? কলেজ –ফলেজ যাই নি।" আসলে সীতুরা যুগের ফল। যুগের ভয়ংকর আর্তানাদ গ্রাস করেছে সীতুদের। ফলে পিতামাতাদের সে তেমন গ্রাহ্য করে না। লেখিকাও সীতুর চরিত্র সম্পর্কে আমাদের জনিয়েছেন –"সাংসারিক বিধি –নিষেধ নীতি নিয়ম এ সবের ধার ধারে না সীতু। সীতুর নীতি যা ইচ্ছে করবে, কোনো কৈফিয়তের উত্তর দেবে না। জেরা করতে এলে এমন একটি মোক্ষম বুলি শুনিয়ে দেবে যে, দু'বার আর জেরা করতে হবে না।" পরিণতিতে যা ঘটার তাই ঘটেছে। সীতুকে পুলিশ ধরে নিয়ে গেছে। আসলে সেই নক্শাল আন্দোলনকালীন সময়টাই ছিল যুব সমাজের

পক্ষে এক আত্মঘাতী সময়। সে সময়ের বিভীষিকা থেকে যুব সমাজের বাঁচা ভয়ংকর ছিল , ফলে বাঁচে নি সীতুরাও।

'বৃত্ত' গল্পের হরিসাধন

চরিত্র লেখিকার জীবনদর্শন ও জীবনবীণার ভাবসত্য বহন করে। লেখিকার জীবনবোধের এক নিদর্শন ফুটে ওঠে চরিত্রের মধ্য দিয়ে। আসলে লেখিকা কী বলতে চান চরিত্র তাই বহন করে চলে। লেখিকা আশাপূর্ণা দেবীর 'বৃত্ত' গল্পের অন্যতম চরিত্র হরিসাধন। সে স্কুল শিক্ষক। তাঁর জীবনের ইচ্ছা ছিল এক সম্পূর্ণ পরিবার গড়ে তোলা, যেখানে কিছুরই অভাব থাকবে না, তা সে পেরেছে।

হরিসাধন সম্পূর্ণ গৃহস্থ বলে যা বোঝায় তাই। কিছুই কিনতে হয় না তাঁকে-"এক পয়সার ঘি বাইরে থেকে কিনি না। টাটকা মাখন, টাটকা ঘি ।" তবে সে সৎ। যা কিছু করেছেন সৎ পথেই। সে দুবারে বিএ পাস করে একটি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। লেখিকাও জানিয়েছেন –"যা কিছু রোজগার করেছেন খোলা পথে, চোরাপথের কারবার নেই।" সদা বিনয়ী ও আত্মভোলা মানুষ সে। হরিসাধনের অহৎকার বলতে কিছু নেই। কিন্তু প্রশ্ন হল সামান্য বেতন তিনি এই বাড়ি , পুকুর, গোয়াল, খামার বাড়ি, ডায়েরি কী করে করেছেন। তাঁর উন্নতির পিছনে রয়েছে পরিশ্রম ও সদাচেষ্টা –"বাড়ি করতে কীভাবে তিনি ইঁট না কিনে পাঁজা পুড়িয়ে ইঁট করিয়েছেন, চুন না কিনে ঘুটিং পুড়িয়ে চুন করিয়েছেন, আর কীভাবে রোদে জলে জরজর হয়ে মিস্ত্রীদের সঙ্গে খেটে পিটে তবে এইটি করে তুলিয়েছেন।"

হরিসাধনের এই যজ্ঞে হাত মিলিয়েছেন স্ত্রীও। স্ত্রীর সোনা বিক্রি করে গড়ে তুলেছেন খামারবাড়ি ও পুকুর। পাঁচ ছেলেমেয়ের একটির বিবাহও দিয়েছেন। তাঁর জীবনে প্রাপ্তি বলে কিছু নেই। আছে কর্মপ্রচেষ্টা ও সাধনা। এই সাধনার বলেই সে সব অসাধ্য সাধন করেছেন –"খাটা চাই। আরামকে হারাম না করতে পারলে আর সংসারের শ্রীবৃদ্ধি হয় না। তা ভাই তোমাদের শুভেচ্ছায় গিন্নীটিও এটা খুব বুঝতে শিখেছেন। রাত চারটে থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত খাটছি দুটি মানুষ !" নিজের কর্মযজ্ঞকে সে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখিয়েছে বন্ধুকে। হরিসাধনের এই কর্মযজ্ঞ দেখে মুগ্ধ হয়েছে শিবানন্দ। লেখিকার ভাষায় মাকড়সা যেমন জাল বাড়িয়ে যায় হরিসাধনও তেমনি একের পর এক কর্মযজ্ঞ বৃদ্ধি করে চলেছে। আর তা দেখে বিস্মিত হয়েছে শিবানন্দ –"বল কি হরিসাধন ! তুমি যে তাজ্জব করলে ! ক্রমশই চমৎকৃত হয়ে যাচ্ছি। পুকুরে মাছ পর্যন্ত ! শিখলে কোথায় এত ?"

অতিথি আপ্যায়নেও সে দক্ষ। স্বামী স্ত্রী মিলে শিবানন্দকে জোড় করে বহু খাইয়েছে। শুধুতাই নয় বন্ধুর বাড়ির জন্য বহু জিনিস দিয়ে দিয়েছে যা শহরে পাওয়া যায় না। নিজেই থলি বহন করে নিয়ে গেছে রাস্তা পর্যন্ত। এমনকি সহজ সরল ভাবে বলেছে –"তোমার আপত্তির জ্বালায় কিছুই দিতে পারলাম নাই ভাই। অবিশ্যি করে একদিন গিন্নীকে আর ছেলেমেয়েকে নিয়ে আসতে হবে।" সে নিজস্ব

বিশ্বাসেই অটল। কখনোই বন্ধুকে আঘাত করে নি বটে, তবে উপদেশ দিতেও ছাড়ে নি –"এতোদিন অন্তত একটু জমি কিনে ফেলা উচিত ছিল তোমার। মাথা গোঁজবার একটু আশ্রয় থাকা দরকার।" হরিসাধন এক বিবেকবান ও আত্মনিষ্ট মানুষ। সে সারাজীবন শুধু সংসারই গুছিয়ে গেছে। সে চেষ্টায় সে সফল হয়েছে।